JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

জাতীয়তাবোধের প্রতিচ্ছবি : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতা

প্রিয়কান্ত নাথ
বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

।।১।।

সমুদ্র পরিবেষ্টিত হয়ে, হিমালয়কে শিরভূষণ করে, উর্বর - অনুর্বর ভূ - ভাগ নিয়ে, উপত্যকা ও অধিত্যকা মিলিয়ে বহু বৈচিত্র্যের প্রাকৃতিক সমাবেশে ভারতবর্ষ আক্রমণ প্রাচীনকাল থেকেই অতুলনীয়া। আচরণ, রীতিনীতি তেও রূপময় এই দেশ। **ভারতবর্ষ** বিশ্বাস করে - বহুত্বে একত্ব, আবার একত্রে বহুত্ব। এই বিবিধতাকে স্বীকার করেই মিলনের এক গভীর উপলব্ধির কথা তাই মহামানব বলতে পারেন এমন করে :

"সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং
সং বো মনাংসি জানতাম।"

কিন্তু এই একাত্মবোধের হাত ধরে চলা ভারতবর্ষের উপর শক - হুন – পাঠান - মোঘল তাদের লোভী দৃষ্টি হেনে বার বার ভারতবর্ষকে করতে চেয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। তাদের আগ্রাসী শোষণের আগুনে ভারতবর্ষের জনগণ বিপর্যস্ত হয়েছে ক্রমাগত। আর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারত - সংস্কৃতিকেই চেয়েছিল সমূলে উৎপাটিত করতে। ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন এই ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে বাধ্য হয়েছিল মাথা নত করে থাকতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শোষণের পথকে সুগম করতেই ভারতবর্ষে শিক্ষা, রেল, ডাক, তার প্রভৃতি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা করেছিল। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দাসত্বের অন্ধকারের ভারতবাসী নিমজ্জিত হলেও ছাই চাপা আগুনের ভেতর থেকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কিরণ রেখা উঁকি দিতে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে। কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে, কোথাও সংঘবদ্ধভাবে। কিন্তু অসম – বিক্রমে পরাধীনতার অপরিসীম গ্লানিকে তারা অতিক্রম করে যেতে পারেনি সহজে। অবশ্য পরাজয় জীবন থেমে যায় না বলেই দেশমাতৃকার বন্দনা সমগ্র ইউরোপীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী অভিজ্ঞতা ও দার্শনিক চিন্তা - ভাবনাকে সম্মিলিত করে জাতীয়তাবোধের নতুন প্রেরণায় উদ্বোধিত করে তোলে নিজেকে - প্রত্যেককে।

ইউরোপে দ্বীপায়ন - এর যুগে জনগোষ্ঠীর আত্মস্বাতন্ত্র বোধের ধারণা, রাষ্ট্রের সার্বভৌম অবস্থানের সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য এবং সেই সূত্রে নিজেকেও স্বাধীন করে তোলার মানসিকতা ও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম - জাতীয়তাবাদের এই প্রাথমিক ধারণা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে ব্যাপ্তি লাভ করে। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট কথিত

রাষ্ট্রিক মঙ্গলের সাথে ব্যক্তির আত্ম - বিকাশের ভাবনাকে অবশ্য ইউরোপ তাদের সুবিধার্থে তাদের মতো করে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত করল | যার ফল হল ঋণাত্মক। কেননা, তার সাথে যুক্ত হলো আত্ম - শ্রেষ্ঠতার অহমিকা।

ভারতবর্ষে প্রায়ই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ - এর সাথে সাথেই পাশ্চাত্য উগ্রজাতীয়তাবাদকে গ্রহণ ও বর্জনের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা মত তৈরি হয় | রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণকে অনুসরণ করে বলা যায়, পৃথিবীতে যে বৈশ্যরাজের পত্তন হচ্ছে, সেখানে বাণিজ্য নিছক মুখোশ মাত্র | উনিশ - শতকীয়

সময়পর্বে বাণিজ্যের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সৌহার্দ্য - সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে | তাই তার আশঙ্কা : "When this organisation of politics and commerce, whose other name is Nation, becomes all powerful at the cost of the harmony of the higher social life, then it is an evil day for humanity." তাই রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্য লিপ্সু পাশ্চাত্যের উগ্র জাতীয়তাবাদকে বর্জন করে ভারতবাসীকে তথা গোটা পৃথিবীকেই জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হতে আহ্বান জানান বার বার | জাতীয় আত্মম্ভরিতা জাতিগত আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বার করে তোলে | সে উন্মাদনায় মানুষ হারিয়ে ফেলে তার বোধ। তাই জাতীয়তাবাদী মুখোশ নয়, জাতীয়তাবোধই হয়ে উঠুক মানুষের মুখশ্রী - এই বার্তা ছিল রবীন্দ্রনাথের |

সাহিত্যে চিরকালই সমকালীন রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক, সংস্কৃতির, আর্থ - সামাজিক আন্দোলনের আলোড়ন ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে থাকে । পরাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীক সেই ডামাডোলের দিনগুলিতে জাতীয়তাবাদ যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, বাংলা সাহিত্য ও সেই ক্রান্তিলগ্নের সময়পর্বে আত্মস্থ করতে চাইছিল সেই সময় ও পরিসরের যুগলবন্দীকে তার আধারে স্থাপন করতে নানা মাত্রায় | সুকুমার সেন বিশ্লেষণ করেন এই অবস্থানকে "বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের প্রথম প্রকাশ দেশের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশপ্রেমের লালন, দ্বিতীয় প্রকাশ জনসাধারণের স্বাধীনতা হীনতার প্রতি সচেতনতা, তৃতীয় প্রকাশ ভারতবর্ষের অখন্ডত্ব অনুভূতি, চতুর্থ প্রকাশ শাসন কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরাধীন প্রজার বল কল্পনা | " আমরা দেখি, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে কাব্যের বিষয় রূপে গ্রহণ করলেন (পদ্মিনী উপাখ্যান,১৮৫৮)| এই ধারাকে পরিপুষ্ট করেন মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন | আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে পুরুষ লেখকদের পাশাপাশি নারী লেখিকাদেরকেও আমরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নিজ ক্ষমতাবলে সাহিত্যাঙ্গনে উজ্জ্বল উপস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে দেখি | এই সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (৩রা ভাদ্র, ১২৬৫; ১৮ই আগস্ট, ১৮৫৮- ২৮শে শ্রাবণ,১২৯০; ১৬ই আগস্ট, ১৯২৪)|

||২||

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ববর্তী সময়েপর্বের এই কবির জন্ম কলকাতার ভবানীপুরে। তাঁর পৈতৃক পদবী ছিল মিত্র (পিতা : হারাণচন্দ্র মিত্র) | ভারতবর্ষ তখন প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বদেশী আনার জোয়ারে মাতোয়ারা। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখী' গিরীন্দ্রমোহিনী অতি অল্প বয়সে (১০ বছর) বিয়ে হয় নরেশচন্দ্র দত্তের সাথে | পিতা এবং স্বামীর প্রেরণায় তিনি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন | যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তার সম্বন্ধে বলেন : "মজিলপুর গ্রামে গিরীন্দ্রমোহিনীর শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল | বাটিস্থ বালিকা - বিদ্যালয়ে ইনি প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থ পাঠের অতিবাহিত হইত। শিক্ষার প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। বিদ্যালয় সর্বদাই তিনি রৌপ্য -পদকাদি সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন | শৈশব হইতেই তাহার চিত্তপরদুঃখকাতর, শান্তিপ্রিয় |" তাঁর শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'র অন্যতম এক সভ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচনা শৈলী দ্বারা তিনি কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন | অবশ্য 'প্রভাব' শব্দটিকে এখানে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করায় সংগত হবে | কেননা, মাত্র পনেরো বছর বয়সে রচিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩)| প্রকাশের পর স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন, " ইহার অনেক স্থান এমন, তাহা কোন প্রকারেই অল্প বয়স্ক বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আশীর্বাদ করি, নবীনা গ্রন্থ কর্ত্রী সর্বসুখ ভাগিনী হউন।" এছাড়া Mookerjee's Magazine'- এ লেখা হয়েছে : "One of the excellences of this little collection that makes it a gem is its equality in respect of quality." আর 'Hindu Patriot' লিখছে : "Kavitahara is a collection of some exquisite pieces of poetry." এই প্রশংসাকে মান্যতা দিয়ে প্রতিভাময়ী কবি 'ভারত কুসুম'(১৮৮২), 'অশ্রুক'(১৮৮৭), 'আভাষ'(১৮৯০), 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ'(১৮৯২), 'শিখা'(১৮৯৬), 'অর্ঘ্য'(১৯০২), 'স্বদেশিনী'(১৯০৫ মতান্তরে ১৯০৬), 'সিন্ধুগাথা'(১৯০৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গীতিকবিতা ধারাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন সুমধুর সুরঝংকারে। সমালোচক তাই বলেন : "সরল আন্তরিকতা এবং শুচিশুভ্র সততাই তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এক্ষেত্রে তাঁকে 'স্বভাবকবি' বলাই সঙ্গত |"

প্রেম, প্রকৃতি, নারী, শোক প্রভৃতি বিষয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী কবিতা লিখেছেন অজস্র | প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন যেমন কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে, অলংকার চয়নে; তেমনি প্রশংসাও কুড়িয়েছেন বিস্তর। শুধু তাই নয়, সূচি শিল্পে তিনি যেমন পারদর্শী ছিলেন, চিত্র - শিল্পী ও তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন | □িশ শতকের প্রথম দশকে গোটা ভারতবর্ষ যখন বঙ্গভঙ্গ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল, সেই সময়ের যুগোপযোগী বিষয় নিয়ে তিনি লিখলেন আঠারোটি কবিতা সম্বলিত কাব্যগ্রন্থ 'স্বদেশিনী' | উৎসর্গপত্রে কবি লিখলেন :

"ভারতের
স্বদেশ ভক্ত নর-নারীর
করে
স্বদেশিনীকে
অর্পণ করিলাম।"

||৩||

ভারতের প্রকৃত ঐতিহ্য সেখানেই নিহিত, যেখানে নানা জাতির বৈচিত্র্য স্বীকার করেও ঐক্যের ভিত্তির সন্ধান করা হয়েছে। এই ঐতিহ্যের ভিত্তি সামাজিক - সাংস্কৃতিক আবহ। কিন্তু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে যে জাতীয়তাবাদের আগমন ঘটে এ দেশে, তা তার জীবন - অভিজ্ঞতার ফসল নয় | নীহাররঞ্জন রায় বলেন : "আমাদের

উনিশ শতকী জীবনান্দোলনের সূচনা অতি স্বল্পসংখ্যক মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠীর হাতে, এবং তাদেরও চিন্তা ও কর্মপ্রেরণাটা এসেছিল পাশ্চাত্য পৃথিবী থেকে, প্রধানত ইংরেজ ও ইংরেজি মারফত।" এই প্রারম্ভিক প্রেরণা থেকে জাতীয়তাবাদ উদ্ভুত হওয়ার ফলে এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে নানা ধরনের অসাম্যের ফাঁক - ফোকর দিয়ে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠতে থাকে, তারই ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে জাতীয়তাবাদ এক উগ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শক্তির একমাত্র লক্ষ্যই ছিল উপনিবেশটিকে দোহন ও শোষণ করে সাম্রারাজ্যের মুষ্টিবন্ধন দৃঢ় ও বিস্তৃত করা | নিজেদের আর্থিক ক্ষমতাকে আরো সুদৃঢ় করা | ফলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোশকে চিনিয়ে দিতে ও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে উদ্যোগ নিলেন এ দেশের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা। ইংরেজি ভাষা, শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতির একাধিপত্য, ইংরেজ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও অর্থবিন্যাসের করালগ্রাস, নবোদ্ভুত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যাক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজের সাথে ব্রাহ্মসমাজের সংঘাত – তৎসহ উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা ও ভারতের উত্তাল রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে উগ্রতার দিকে ঠেলে দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও প্রথম দিকে এর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল জাতি – ধর্ম - সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে দেশজ ঐক্য স্থাপন ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে | কিন্তু বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বহু সংগঠন গড়ে ওঠা ও ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশে ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে ১৯০৩ সালে বাংলার ছোটলাট এন্ড প্রেসার - এর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বাংলাকে ভাগ করতে সম্মত হয় | এই পরিকল্পনায় স্থির হয়, ঢাকা - রাজশাহী –চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে যুক্ত করে তৈরী হবে একটি নতুন প্রদেশ; আর বাংলার অবশিষ্ট অঞ্চল, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে হবে আরেকটি প্রদেশ | ১৯০৫ সালের ১৯ শে জুলাই ব্রিটিশ সরকার এই আইন পাস করে আর তা বাস্তবায়িত হয় ১৬ ই অক্টোবর | কিন্তু আপামর বাঙালি সেদিন এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল | প্রতিবাদ প্রতিরোধে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা বঙ্গদেশ | নলিনীকান্ত সরকারের ভাষায়, "সারা বাংলাদেশে বিক্ষোভের ঝড় ওঠল | এ এক অভিনব জাগরন |" রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাখীবন্ধন উৎসবের মাধ্যমে তাতে যোগ করেছিলেন এক নতুন মাত্রা | "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে/ মোদের বাঁধন ততই টুটবে।" - এই রবীন্দ্রবাণী প্রত্যয় যোগালো বাঙালিকে জাতির জীবনে এলো নতুন জোয়ার |

||৪||

'অশ্রুকণা' - খ্যাতা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে উদ্বোধিত হয়ে 'স্বদেশিনী' কাব্যগ্রন্থের 'আশীর্বাদ' নামক কবিতায় আহ্বান জানালেন স্বদেশবাসীকে –

"এস শিরে লয়ে আশিষ মাতার
পর আঁটি অঙ্গে বর্ম একতার
ধরহ একতা কিসের ভয়
সাহস যাহার তাহারি জয়।
ভেরি শঙ্খনাদে করি ঘোর ধ্বনি
জাগায়ে নিদ্রিতে কাঁপায়ে অবনী

নবীন আশার রোলে
দ্রুত আয় - আয় - আয় চলে -
যেমন ঝটিকা ধায়।
তাই এত দিনে যদি ফুটেছে নয়ন
মনের মাহাত্ম্য কর না নিধন
কারো কাছে প্রভু; - প্রাণ কিবা ধন -
যদি স্থাপিবে জগতে বাঙালি নাম।"

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের পাশাপাশি গিরীন্দ্রমোহিনীও সংকীর্ণ জাত্যাভিমান ভুলে সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক হওয়ার মন্ত্রে আহ্বান জানালেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে এদেশের মানুষকে শোষণ করার মূল মানসিকতায় তিনি প্রথমেই কুঠারাঘাত করতে চাইলেন। সরাসরি আহ্বান জানালেন -

"ভুলি হিন্দু মুসলমান
প্রীতি সূত্র কর দান;
বাঁধ সুক্ষ সূত্র - মূলে বিরাট জীবন
কর মনে দ্রৌপদীর বেণী বাঁধা পণ।" (রাখীমন্ত্র)

বঙ্গমাতাকে দ্বিখন্ডিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি পরামর্শ দিলেন রাখী - বন্ধনের -

"আজিকার দিনে স্মরিয়া মায়ের মুখ,
হরিষে - বিষাদে বাঁধিনু মঙ্গল – রাখী;
পুতচিত্তে শুভক্ষণে ওই ভূজমূল,
অচ্ছেদ্য বন্ধনে; হিন্দু - মুসলমান ভুলি;
যে আশায় – দৃঢ়তম - অটুট রহুক
সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন; এ প্রার্থনা চির,-
কর্মক্ষেত্রে যেন এই পবিত্র বন্ধন
দানে সদা বজ্রশক্তি ও বাহুযুগলে।" (রাখীমন্ত্র)

স্বর্ণকুমারী দেবী যাঁর সম্বন্ধে কবিতা আকারে বলেছিলেন, "অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে"- সেই গিরীন্দ্রমোহিনী লক্ষ্য করেছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে এক নূতন প্রাণময়তা। ভারতবাসী যদি আবার নিজের আত্মশক্তি ফিরে পায় তবে সম্ভব পরাধীনতার জ্বালা ঘুচিয়ে স্বাধীনতায় অবগাহন করা। আর এ জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করা। কবি তাই দীক্ষা দিতে চাইলেন নতুন - মন্ত্রে –

"কে বলে ভেঙেছে অঙ্গ ভেঙেছে মোহের বাসা, -
জাগিয়া উঠেছে বঙ্গ - হৃদয়ে তরুণ আশা।
ভেঙেছে ঘুমের ঘোর

নিরাশ বিলাস - চোর

ঐ উদিত সুখের ভোর – কাকলী নবীন ভাষা,

কে বলে ভেঙেছে বঙ্গ ভেঙেছে মোহের বাসা |

তবে ঘৃণিত বিলাসবাস চরণে দলিয়া সই

কল্যাণী নবীন সাজে সাজালো মঙ্গলময়ি।

দাও প্রবাহিত ক্ষতে অমৃত – প্রলেপ – স্নেহে,

কোমল শীতল কর বুলাও পীড়িত দেহে;

ধোয়াও নয়নে - নীরে মায়ের বেদনা অই,

দেহ শক্তি সঞ্চারিয়া অঙ্গে - অঙ্গে শক্তিময়ী |

দেহ - দেহ নবশিক্ষা নবমন্ত্রে লহ দীক্ষা

ভুলাও ভারতে ভিক্ষা, দেহ প্রাণে নব বল,

দুখিনীর দুখ নীর মুছাইতে চল - চল।

শত সুত শত সুতা

হইলে সেবা নিরতা

মুহূর্তে দূরিবে ব্যথা, আসিবে নবীন বল,

মায়ের আশীষ সে হবে গৃহে – গৃহে সুমঙ্গল।"(অঙ্গচ্ছেদ)

আমরা লক্ষ্য করবো, প্রাগুক্ত কবিতায় কবি শুধু দেশমাতৃকাকে জীবন্ত মায়ের আদলেই গড়েননি, তিনি আমাদের দুর্বলতা ও ব্যাধিকেই চিহ্নিত করেননি; তার প্রতিবাদের পথও বাতলে দিয়েছেন | 'ব্যাধি ও তার প্রতিকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিংবা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যেভাবে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন চিত্তশুদ্ধি কথা বলে; গিরীন্দ্রমোহিনীও তেমনি জীবনকে নতুন প্রাণের ছোঁয়ায় জাগিয়ে তুলতে চাইলেন | শুধুমাত্র ভাবাবেগকে জাগিয়ে তুলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না | আমরা সব বিষয়ে আরও লক্ষ্য করি, কর্মক্ষেত্রের মধ্যেও তিনি জানতে চাইলেন নব উদ্দীপনা | যে আবেগ তিনি লক্ষ্য করলেন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে ভারতবাসীর মনে; সেটাকেই কাজে লাগিয়ে তিনি আমাদের স্থবির হয়ে যাওয়া জীবন - যাপনের মধ্যেও দিতে চাইলেন জোয়ার - শক্তি | তাই আহ্বান জানালেন :

"ওই ভরা গাঙে এসেছে জোয়ার

ও ভাই ঝট চলে আয়, আয় কে যাবি পার।

ওঠে উঠুক বাতাস ভয় কি তাতে এবার পাকা মাঝি আছে সাথে

তার আশার পসরা সাথে ওরে দুগুণো ব্যাপার -

ঝট চলে আয় - আয় কে যাবি পার।

'বদর' বলে নৌকা খুলে সাহস - পালে যাবে চলে

দাঁড়িয়ে আর থাকব না খুলে লেগেছে বেজার |

ওরে দুপুর - রোদে ফাটিয়ে মাথা সার হয়েছে ছেঁড়া কাঁথা

মরে অনাহারে বৃদ্ধা - মাতা বলবো কত শুনবি কি আর;

ও ভাই ঘরের লক্ষী পরকে দিয়ে ঘুরে বেড়াই দুয়ার - দুয়ার
এবার পণ করেছি শোনরে মিতে ঘুরবো না আর পথ - বিপথে
পাবই অন্ন আধেক রাতে - চিনির বলদ নয়কো এবার ।" (বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান)

ঘরোয়া আটপৌরে ভাষায় এই আহ্বান, এই আত্মবিশ্বাস, এই একতার মন্ত্রে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান প্রাণশক্তি ছিল সেদিন নিঃসন্দেহে । ভারতের বীরদের কাহিনী শুনিয়ে বরাভয় দিতে চেয়েছেন কবি:

ক। "সদা বীর প্রসু ভারত জননী
বীর রত্ন মালে কোহিনুর মণি
স্মর শিবময় শিবাজী কাহিনী
সহায় ভবানী অমূল্য দান ।" (শিবাজী উৎসব)

খ। "এমনই প্রচন্ড নৃত্যে নারী গরীয়সী
নেচেছিল ঝানসির শ্রেয়সী মহিষী।" (সমুদ্র গর্জন শ্রবণে)

রবীন্দ্রনাথ আহুত রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীর একতার মন্ত্রে এগিয়ে আসার মাহেন্দ্রক্ষণ তার কাছে স্বাধীনতার প্রথম উদযাপনের মতই। আশাবাদী কবি তাই দেখছেন :

"আজি কি শুভদিন আইল
চির মনোরথ পুরিল;
মা তোমার কোটি - কোটি পুত্রগণ
ছিল মোহ - নিদ্রা ভরে বিচেতন
আজিকার নব — তপন - কিরণে
সবে আঁখি মেলি জাগিল ।
পুজিতে তোমার পুণ্য - চরণে
সমবেত সবে দেখ একসনে
মা - মা - মা - মা বলে বিদারী গগনে
হের আখি নীরে ভাসিল ।
কই মা কোথা মা রাজ - রাজেশ্বরী
কি ভ্রমে আছিনু তোমারে পাসরি -
কোলে নে মা নে মা আর ভুলিব না
বলিয়া চরণে লুঠিল।" ('রাখী সংক্রান্তি')

পরাধীনতার যন্ত্রণাকে এভাবেই মুক্তির বরণীয় ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন কবি গিরীন্দ্রমোহিনী। এমনি করেই আমরা স্বর্ণকুমারী দেবী কেও দেখি একই প্রেরণায় উদ্বোধিত হতে:

"শত কণ্ঠে করো গান জননীর পুত নাম

মায়ের রাখিবো মান – লয়েছি এ মহাব্রত ।

আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,

এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত ।"

।।৫।।

মানুষে মানুষে সংকীর্ণ ভেদাভেদ ভুলে মানবিকতার নতুন দীপ্তিতে গিরীন্দ্রমোহিনী জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন দেশবাসীকে । সাম্রাজ্যবাদ - বিরোধী আন্দোলনে উগ্র স্বদেশী আনা নয়, একাত্মতার মন্ত্রে সংজ্জীবিত হয়ে উঠুক দেশবাসীর – এই ছিল তাঁর লক্ষ্য । বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের মহামিলন - দিবসে রবীন্দ্রনাথ যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালি জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমগ্র বাঙালি জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলি প্রয়োগ করিব"; তেমনই মৈত্রীর মধ্য দিয়েই যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হতে পারে, গিরীন্দ্রমোহিনী কবিদৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল সত্যরূপে । ভারতবর্ষের সে মূলমন্ত্র সর্বধর্ম সমন্বয় । চাষি কিংবা শ্রমিক কিংবা মাঝিই নয় শুধু সকলেই সাথে নিয়ে সকলের সাথে পা মিলিয়ে বাংলার তথা ভারতের চরম ক্রান্তিলগ্নে যে জাতীয়তাবোধের মিলন গীতি রচনা করলেন গিরীন্দ্রমোহিনী; তা আসলে বাংলার জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক অভিঘাতের স্বাক্ষর ।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ বারিদবরণ (সম্পাদনা) : 'সমকালীন সাহিত্যে বঙ্গভঙ্গ'

২. গুপ্ত যোগেন্দ্রনাথ : 'বঙ্গের মহিলা কবি'

৩. বন্দোপাধ্যায় নন্দিনী : 'ভোরের পাখিরা'

৪. বিশ্বাস কৃষ্ণকলি : 'উনিশ শতকের বামা লেখনী'

৫. রায় নীহাররঞ্জন : 'ভারতে ইতিহাস জিজ্ঞাসা'

৬. দাশ আশা : 'ভারত - ভারতবোধ - ভারত সংস্কৃতি'